বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুঃ-ফেব্রুঃ, ১৯৮১ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত দাম : ৫০ পয়সা

● স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী শিক্ষা—২ ● সাহা ইনস্টিটিউট—৭ ● সমস্যা : প্রথম পাঠ—১০ ● নিউক্লিয়ার নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বিবৃতি—১২ ● প্রসঙ্গ : বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ—১৪ ● স্মারকলিপি—১৫ ● 'মানুষ' পত্রিকা প্রসঙ্গে—১৫

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের "পবিত্রতা" গেল গেল বলে একটা রব আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। সোরগোল তুমুলে ওঠে যখন কায়েমী স্বার্থের খোদ দপ্তরের বেআইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে এবং তা জনসমক্ষে প্রচারিত হয়। তখন অনেক সমাজপতি "বিজ্ঞানাচার্য" থেকে শুরু ক'রে বাজারী সংবাদপত্র একই সুরে গাইতে থাকে 'শিক্ষা রসাতলে গেল, বিজ্ঞান গবেষণা রসাতলে গেল' ইত্যাদি আরও কত কি। সম্প্রতি সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ও বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশনা এর সাক্ষী। স্বভাবতই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি যে ভাবেই পদদলিত হোক না কেন এই সমস্ত বাজারী সংবাদপত্রের তাতে কিছুই যায় আসে না—সৎ সাংবাদিকতার এ হেন নজীর বোধ হয় আমাদের দেশ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া দুষ্কর। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কর্তাব্যক্তিদের খেয়ালখুশিমত চলতে পারলে প্রোমোশন আছে, বিদেশ ভ্রমণ আছে, গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আশা আছে। আর তা না করতে পারলে স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী পদোন্নতির আশা ত' দূরের কথা, পদাবনতির আশঙ্কাও থাকে। আর ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য প্রতিবাদ করলে, কর্মীদের সংগঠিত করলে, ভাগ্যে জুটবে মিথ্যা অপবাদ, নির্যাতন, এমন কি ছাঁটাইয়ের নোটিশ। ছাঁটাই হলেও আইনের আশ্রয় নেওয়া যাবে না কারণ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নাকি 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্ক বর্তমান। 'প্রভুর' কোনরকম গণতান্ত্রিক রীতিনীতি না মানলেও চলে কিন্তু ভৃত্যের সমস্ত আইনকানুন মেনে চলতে হবে, এই হ'ল বিধান। এই ধরনের আইনের ফাঁস দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানকর্মীদের বহন করতে হচ্ছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে এই ফাঁসে লটকে রয়েছেন লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞান-কর্মী। বিজ্ঞান শিক্ষকরাও যে এই ফাঁদের আওতার মধ্যেই তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রহড়ার বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের ঘটনা। এই বর্বরোচিত মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার অবসান না হলে বিজ্ঞান গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না একথা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কি চলছে তা না জানলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও সফল হতে পারে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বন্ধুদের কাছে আমরা জানতে চাইছি তাঁদের প্রতিষ্ঠানের কথা। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'তে সেই লেখা প্রকাশে আমরা আগ্রহী।

এই সংখ্যায় আমরা সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর সাংগঠনিক কাঠামো ও বিজ্ঞান গবেষণা সম্পর্কিত একটি নিবন্ধ প্রকাশ করছি। এ ছাড়া থাকছে গত তিন দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কিত একটি তথ্যমূলক নিবন্ধ। জাপান বিজ্ঞান সমিতির নিউক্লিয়ার নিরস্ত্রী-করণ সম্পর্কিত বিবৃতি এবং বহু বিতর্কিত ও সম্প্রতি বহু আলোচিত প্রথম পাঠের সমস্যার ওপর নিবন্ধও থাকছে।

আপনাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করে তুলুন।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী শিক্ষা

[The situation of technical education in West Bengal during the post-independence period (1948-'78) has been reviewed. It appears that although there has been significant physical expansion of facilities for technical education during the first half of this period when an attempt was also made to import a need-based orientation, the drawbacks in policy and planning began to be apparent during the second-half. The links between technical education and economic development have been indicated and the need for a serious rethinking has been stressed.]

প্রস্তাবনা

দেশ ও সমাজের অগ্রগতিতে বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষমাত্রেই কম বেশী সচেতন। বর্তমান রচনার ক্ষুদ্র পরিসরে আমাদের সীমিত লক্ষ্য হ'ল স্বাধীনতা-উত্তরকালে কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটি বিশ্লেষণের একটি প্রাথমিক প্রয়াস। কিন্তু কাজটি মোটেই সহজ নয় কারণ প্রয়োজনীয় তথ্যাদির একান্ত অভাব। স্বভাবতই কিছু তথ্যের সঙ্গে কিছু অনুমান ও প্রচলিত ধারণার সংমিশ্রণে আমাদের আলোচনার সূচীমুখ নির্ধারণের প্রয়াস পেতে হয়েছে। তাছাড়া আরও একটি বিরাট অসুবিধা হ'ল বিষয়টির সর্বভারতীয় চরিত্র—কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণ হয় মূলত কেন্দ্রীয়ভাবে। তাই শুধুমাত্র একটি রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা করে বেছে নেওয়া অনেকক্ষেত্রে শুধু দুরূহ নয় অসম্ভবও। তবে এই কারণেই, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশ্লেষণ—যেটি অবশ্যই আংশিক—খানিকটা ভারতীয় ছবিও ফুটিয়ে তোলে।

মূল বিষয়টিতে যাবার আগে যদি আমরা একবার ছক—১ এর প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহ'লে সাদামাঠাভাবে শিল্পোন্নয়ন ও কারিগরী উন্নতির ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কিছু কার্যাবলীর আন্তঃসম্পর্কটি কিছুটা বোঝা যাবে।

কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান

কারিগরী শিক্ষাক্রমের একেবারে নীচের ধাপে আছে কারিগরী স্কুল ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (আই. টি আই.) গুলি। ১৯৪৭-এর আগে ভারতে এধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তার পরের ধাপ—পলিটেকনিক কলেজগুলি সম্পর্কেও সেকথা প্রযোজ্য। ১৯৪৭-এ ভারতে মোট ৫৩টি পলিটেকনিক ধরনের কলেজ ছিল, বছরে গড়ে ৩৭০০ ছাত্র সেগুলিতে ভর্তি হতে পারতো, পাশ করে বেরোত বছরে গড়ে ১৫০০ ছাত্র। স্বাধীনতা লাভের পর দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে পৌঁছবার তাগিদে কারিগরী শিক্ষার স্কুল ও ডিপ্লোমা কলেজের (পলিটেকনিক) সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলে প্রায় ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ১৯৬৬ সালে এসে ভারতে ডিপ্লোমা কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৬ যাদের মোট ছাত্রগ্রহণ ক্ষমতা দাঁড়ায় প্রায় ৫১০০০ এবং বছরে প্রায় ২৪০০০ জন ছাত্রছাত্রী এগুলো থেকে পাশ করে বেরোতে থাকে। কারিগর তথা দক্ষ যন্ত্রী ও ইঞ্জিনীয়ারদের মাঝামাঝি থেকে নীচের ও উপরের কাজের পরিপূরক ভূমিকা গ্রহণ করবে এইসব ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়াররা—এটাই ছিল আশা।

উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজির প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তাছাড়া গবেষণাও এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর অঙ্গীভূত। স্বাধীনতা-উত্তর

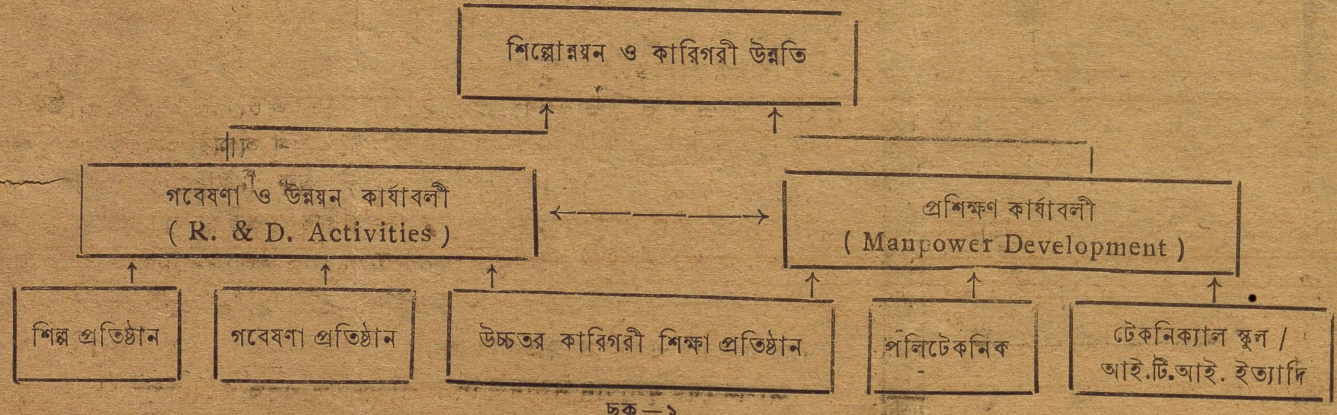

ছক—১

ভারতে এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা—পাঁচটি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি'র (আই. আই. টি.) প্রতিষ্ঠা, যার প্রথমটি স্থাপিত হয় ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুরে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখ্য কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজি বিভাগসমূহ, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর ও জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং লেদার, সেরামিক, টেক্সটাইল ও প্রিন্টিং টেকনোলজির কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজও পশ্চিমবঙ্গে একটি করে আছে, যদিও এগুলি আমাদের হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী শিক্ষা

সারণী-১এ স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা, মোট ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণ ক্ষমতা, ছাত্রছাত্রী ভর্তির ও উত্তীর্ণের প্রকৃত সংখ্যা দেখানো হয়েছে। ক্ষমতা ও প্রকৃত ভর্তির সংখ্যার তারতম্য এমনিতেই কিছুটা ঘটতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু মাঝে মাঝে বিরাট তারতম্য ঘটেছে ঘোষিত সরকারী নীতি অনুযায়ীই। যেমন ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সংঘর্ষের পটভূমিতে তাড়াতাড়ি বেশী সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার প্রশিক্ষণের নীতি গৃহীত হয়—ডিপ্লোমা কলেজ ও টেকনিক্যাল স্কুল-গুলি দ্রুত স্থাপিত হতে থাকে। আবার সাধারণভাবে ইঞ্জিনীয়ার-দের এবং বিশেষভাবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের ব্যাপক বেকারীর মুখো-মুখি হয়ে ১৯৬৮তে পলিটেকনিকগুলিতে ভর্তির সংখ্যা সর্বভারতীয়ভাবে ৩৭০০০-এ নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যদিও ঐ বছর ২৭০০০-এর বেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়নি। ১৯৭৪ এর পর আবার এই কড়াকড়ি তুলে দেওয়া হয়।

সারণী-১ এর সংখ্যাতথ্য থেকে দেখা যায়:

(১) স্নাতকোত্তর ও স্নাতক পর্যায়ে ১৯৫০-এই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান চালু ছিল। পরবর্তী দুই দশকে এই স্তরে প্রতিষ্ঠান সংখ্যা অল্প বেড়েছে কিন্তু আসন সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী বেড়েছে।

(২) ১৯৫০-৬০ দশকে পলিটেকনিকগুলি খুব দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়, ৬০-৭০-এর দশকেও এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং আগমন সংখ্যা ১৯৬০-এর তুলনায় ১৯৭০এ প্রায় দ্বিগুণ হয়। এই দশকেই জুনিয়ার পলিটেকনিকগুলি দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ছাত্র ভর্তির ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

(৩) প্রায় সবকটি পর্যায়েই ১৯৬০-৭০ এর মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জিত হয়।

(৪) ভর্তি ক্ষমতার অনুপাতে উত্তীর্ণের হার সবচেয়ে ভাল, সারণীর অন্তর্ভুক্ত বছরগুলির মধ্যে ১৯৭০এ। তারপর সর্বক্ষেত্রেই দ্রুত অবনতি; ১৯৭৫-এর পর আবার উত্তীর্ণের হারে অল্পাধিক উন্নতি দেখা যায়।

(৫) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ক্ষমতার প্রায় অর্ধাংশ থেকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়েছে (উত্তীর্ণের হিসাবে)। স্নাতক পর্যায়েও অর্ধেক থেকে পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লেগেছে কিন্তু পলিটেকনিকের ক্ষেত্রে নীচের দিকে প্রায় এক পঞ্চমাংশেও তা নেমে এসেছে। আর উপরের দিকে তা সত্তর শতাংশের বেশী কখনও হয়নি। জুনিয়ার ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে এক অষ্টমাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ ক্ষমতার ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৯৭০ এর পর থেকে এ রাজ্যে কারিগরী শিক্ষার চিত্রটা স্থানু অথবা অবক্ষয়ী। কাঠামোর দিক থেকে বলা যায় ব্যবস্থাটা মাথাভারী। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তুলনা-মূলকভাবে বেশী সংখ্যায় ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। নিচের দিকে ছাত্রভর্তি হয় জোর করে নয় আপনা থেকে সীমিত হলেও উপরের দিকে কিন্তু ছাত্রভর্তি প্রায় অব্যাহত থাকে। আর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তো আসন সংখ্যা ১৯৭০ এর পরেও অনেকটা বেড়েছে। বস্তুত আন্ত-র্বৈষয়িক / জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ইত্যাদি প্রকারে চিহ্নিত করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন স্নাতকোত্তর কোর্স খোলা অব্যাহতই আছে। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে যে ডিপ্লোমা ও জুনিয়ার ডিপ্লোমা কোর্সগুলিতে প্রকৃত ভর্তির সংখ্যা কোন সময়েই ক্ষমতার কাছা-কাছি পৌঁছায়নি এবং যা ভর্তি হয়েছে তার তুলনায় পাশ করে বেরিয়েছে অনেক কম অর্থাৎ অনেকেই যে মাঝপথে ইতি টেনে দেয় তা স্পষ্ট।

এরকম হবার কারণটা কি? প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার সময় তো আমরা ভবিষ্যৎ শিল্পায়নের যে ছবি এঁকেছিলাম তাতে প্রচুর সংখ্যক মাঝারি স্তরের কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন হবার কথা। সেই অনুসারেই ডিপ্লোমা কলেজ, জুনিয়ার ডিপ্লোমা স্কুল ও আই. টি. আই. গুলি গড়ে তোলা হয়। তবে? আর, এটাই বা কেমন করে ঘটল যে উচ্চতর কারিগরী শিক্ষার মোটা-মুটি ভাল চাহিদা আছে অথচ মাঝারি ও প্রাথমিক স্তরের কারিগরী শিক্ষার কোন চাহিদা নেই।

এসব প্রশ্নের নিশ্চয়ই কোন সহজ উত্তর নেই, তবে এটুকু বোঝা যায় যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার চাহিদা যতটা না শিল্পায়নের প্রয়োজনে তার চেয়ে বেশী অন্য কারণে। এটা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ইঞ্জিনীয়ার টেকনোলজিস্টদের একটা বৃহৎ অংশই দেশীয় উৎপাদনের

কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে না। ব্যাঙ্ক, ম্যানেজমেণ্ট বা পরিচালনা এবং বিদেশ একটি বৃহৎ অংশকে টেনে নিচ্ছে। সাম্প্রতিক এক সূত্র অনুযায়ী দেশের শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পাশ করা ছাত্রদের শতকরা ২৫ জন—অধিকাংশই উপরের দিকের—বিদেশে পাড়ি দেয়। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে গড়ে শতকরা ৫ জন ইঞ্জিনীয়ারিং-এ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী বিদেশে পাড়ি দেন বলে অনায়াসে ধরা যায়। আর এই সব বিদেশগামীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত অর্ধেকই যে আর দেশে ফেরে না এ অনুমানও নিতান্ত ভুল হবে না।

কিন্তু শুধু একারণেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের মন্দাভাব (এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে) ও বিকৃত চেহারাও এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য কিছুটা দায়ী। স্বাধীন ভারতে বড় শিল্প গড়ে উঠেছে আগাগোড়া বিদেশী সহযোগিতার ভিত্তিতে। সেখানে আধুনিক কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ইঞ্জিনীয়ারদের চাহিদা কিছুটা থাকতে পারে কিন্তু অন্যান্য কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিকই যথেষ্ট। দেশীয় শিল্প মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গীও ডিপ্লোমা ও জুনিয়র ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কারিগরদের নিয়োগের অনুকূল নয়। তার সঙ্গে অবশ্য যোগ করা যেতে পারে এই পর্যায়ের শিক্ষার নীচু মান ও করুণ অবস্থাকে—কিন্তু সেটা কখনই মুখ্য নয়।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বেশ কিছু নামী ও সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় নিজস্ব (কারিগরী) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি প্রবল ঝোঁক। এরা বরং স্কুলের গণ্ডী পেরোনো তরুণদের শিক্ষানবীশ হিসেবে নিয়ে প্রশিক্ষিত কারিগর তৈরী করে নেবে কিন্তু টেক্‌নিক্যাল স্কুল কলেজ থেকে পাশ করা ছেলেদের সরাসরি নিয়োগ করবে না। এ ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ সে বিতর্কে না গিয়েও একথা অবশ্যই বলা যায় যে এর ফলে এমনিতেই সীমিত কর্মক্ষেত্র আরও সংকুচিত হয়েছে এবং কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থার মূলেই আঘাত পড়েছে।

সারণী-২ এর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে যে শিল্পে নিযুক্ত উচ্চ কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারদের প্রায় অর্ধেকই হয়তো আর কারিগরী কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। এবং ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারদের তুলনায় অভিজ্ঞ অথচ প্রথাগত শিক্ষায় অশিক্ষিত কারিগরদের কদর প্রায় সব ক্ষেত্রেই বেশী। সুতরাং ১৯৬৮ সালের শেষে যদি দেখা যায় যে প্রায় ৫৭০০০ শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার বেকার এবং তার মধ্যে ৪৬০০০ এরও বেশী সংখ্যক ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, (দামোদরণ কমিটির রিপোর্ট), তাহলে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে, পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিগ্রীপ্রাপ্তদের মধ্যে বেকারত্বের কথাটা উল্লেখ করা যায় (সারণী-৩)।

সারণী-৩

পশ্চিমবঙ্গের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের নথিভুক্ত কর্মসন্ধানী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনীয়ার (সংখ্যা)

সাল	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭
সংখ্যা	২৩০৩	১৮৮৮	১৬৬১	২২৯১

সূত্রঃ ইকনমিক রিভিউঃ পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৯-৮০)

হয়তো একথা ঠিক যে রেজিষ্ট্রীকৃত এই সংখ্যা সঠিক অবস্থার দ্যোতক নয়, কেননা এদের একটা বৃহৎ অংশ হয়তো উপযুক্তভাবে নিযুক্ত না হওয়ায় ভাল কর্মক্ষেত্রের সন্ধানী, পুরোপুরি বেকার নয়, তবুও অবস্থাটা সুখকর বলা যায় না। আর এটাও সহজেই বোঝা যায় যে কর্ম-সন্ধানী ইঞ্জিনীয়ারদের বেশীর ভাগই ডিপ্লোমা স্নাতক।

উপরের আলোচনা ও তথ্যাদি থেকে আমরা পাচ্ছি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কারিগরী শিক্ষার চাহিদা ডিপ্লোমা ও জুনিয়ার ডিপ্লোমা শিক্ষার তুলনায় কিছুটা বেশী ঠিকই কিন্তু সে চাহিদা কিছুটা কৃত্রিম—দেশীয় কারিগরী বিকাশের সঙ্গে তা সম্পর্কযুক্ত নাও হতে পারে। অথচ এই পর্যায়ের কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিই স্বাধীনতা-উত্তর ভারত বেশী নজর দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষার জন্য একদিকে যেমন ক্যালিফোরনিয়া কিংবা ম্যাসাচুসেট্‌স ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির অনুসরণে গড়ে উঠেছে পাঁচটি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, অন্যদিকে তেমনি কারিগরী শিক্ষার পুরনো প্রতিষ্ঠান-গুলিকে নতুনভাবে পুনর্গঠিত করে আই. আই. টি-গুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করানোর সচেতন প্রয়াস চালানো হয়েছে। অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এর একটি মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী ফল হয়েছে এই যে জাতীয় কারিগরী শিক্ষা উদ্ভাবনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরী শিক্ষার বিভাগগুলি ক্রমশঃ তাদের স্বকীয়তা ও আদর্শ হারিয়ে ফেলছে।

শিক্ষা কমিশন (কোঠারি) দেখিয়েছেন যে আই. আই. টির গড় ছাত্রছাত্রী অন্যান্য কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গড় ছাত্রছাত্রীর তুলনায় অনেক সম্পন্ন পরিবার থেকে আসে এবং সিঁড়ির সবচেয়ে নীচে আছে জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল বা আই. টি. আইগুলি। আর এটাও আমাদের সকলেরই জানা যে স্কুল ফাইন্যাল বা তারও নীচের যে সব ছাত্র কোনক্রমেই পড়াশোনায় এঁটে উঠতে পারছে না, শেষ সম্বল হিসেবে তারা আঁকড়ে ধরতে চায় জুনিয়ার ডিপ্লোমা স্কুল বা আই টি. আইকে। পলিটেকনিকের অবস্থাও প্রায় তেমনি। আবার এমনই মজা যে কারিগরী শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাল ফল করলেও নীচু থেকে উঁচুতে ওঠা প্রায় অসম্ভব। জুনিয়ার ডিপ্লোমায় খুব ভাল ফল করতে পারলেও পলিটেকনিকে ঢোকা যেমন শক্ত, তেমনি

পলিটেকনিকের ছাপ নিয়ে ডিগ্রী পাবার আশা দুরাশাই বলা চলে। এটা নিশ্চয়ই একটা কারণ যেজন্য কারিগরী শিক্ষার নীচের পর্যায়-গুলিতে ভাল ছাত্রের একান্ত অভাব। শিক্ষার মানও স্বাভাবিকভাবেই নীচু। উদ্দেশ্য যাই থাক, ভারতে উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা বলতে গেলে অর্থনৈতিকভাবে সবল ও সোচ্চার গোষ্ঠীর কুক্ষিগত আর অর্থ-নৈতিকভাবে দুর্বল ও মূক যারা তাদের জন্যই যেন জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল, আই. টি. আই এবং কিছুটা পলিটেকনিকের বদান্যতা।

সে যাহোক, দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতালাভের আগে যে ধারায় কারিগরী শিক্ষা চলতো স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তাকে নতুনভাবে গড়েপিটে নেওয়ার একটা প্রয়াস দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু ক্রমশঃ তা বানচাল হয়ে গিয়ে যেন আবার সেই পুরনো অবস্থায় ঠেকতে চাইছে।

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে পূর্বোক্ত দামোদরণ কমিটির (১৯৭০-৭১, পলিটেকনিক ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য নিযুক্ত) সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন বিদেশী প্রতিনিধির মন্তব্য তুলে ধরব। উক্ত কমিটিতে পশ্চিম জার্মানী, আমেরিকা, ব্রিটেন ও জাপানের একজন করে প্রতিনিধি ছিলেন—উপদেষ্টা হিসেবে। তাঁদের মন্তব্যগুলি কখনও কখনও তীব্র সমালোচনামূলক—কিন্তু কেবল সে কারণে এগুলিকে প্রাসঙ্গিক মনে করা হচ্ছে না। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কারিগরী শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনার প্রয়াস পেয়েছি কিন্তু কোন কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য বা অসাফল্য এমন অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল—যে বিষয়ে এখানে কোন আলোচনাই করা হয়নি। মন্তব্যগুলির মাধ্যমে সেগুলির ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রতিনিধিদ্বয়ের যুক্ত মন্তব্য :

"...(ভারতে) ভ্রমণকালে যাদের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁরা যেন ধরেই নিয়েছেন যে পাঠ্যক্রমের (curricula) কম-বেশী পরিবর্তন করে নিলেই পলিটেকনিক স্নাতকরা শিল্পের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।...শিক্ষার সঙ্গে জড়িত কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে আগে থেকেই একটা ধারণা হয়ে গেছে যে 'স্যাণ্ডউইচ' ধরনের পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন ঘটালেই সব মুস্কিল আসান হবে।...তাঁদের কথাবার্তায় এমন আভাষ পাওয়া গিয়েছে যে শিক্ষার মান ও প্রণালী সব সমালোচনার উর্ধ্বে। আমাদের বিশ্বাস (ভারতের ডিগ্রী কিংবা ডিপ্লোমা স্তরের ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার সমস্যার গভীরে) আরও বহু বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ দিক রয়েছে।

"শহরের পর শহরে আমরা দেখেছি অল্প অল্প দূরত্বে একই ধরনের শিক্ষার জন্য বাড়ী ও যন্ত্রপাতিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।... শিক্ষাখাতে যেটুকু অর্থসঙ্কুলান করা সম্ভব তাতে এই ধরনের পুনরাবৃত্তি বাজে খরচ বলেই মনে হয়।

"শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মক্ষেত্রের হ্রাসবৃদ্ধির সমস্ত দায়িত্ব বর্তেছে শিক্ষাব্যবস্থারই ঘাড়ে অথচ তাদের প্রকৃত নিয়োগক্ষেত্র শিল্প কারখানাগুলি ন্যূনতম কর্তব্যের দায়ও এড়িয়ে গেছে—যদিও কাজের যখন অভাব দেখা দিয়েছে, তখন তারা ইঞ্জিনীয়ার বাছাই করার ক্ষেত্রে হয়েছে শুচিবায়ুগ্রস্ত।...

"...মনে হয় ছাত্রদের চিন্তা করবার, শিখবার, পড়বার, মানুষ ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে একটা সুষম বোধ জন্মাবার এবং এমনকি একটি সুস্থ মনকে ঘিরে সুস্থ দেহী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠবার কোন সময়ই দেওয়া হয় না। তবুও আশা করা হয় ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্তরা ভবিষ্যতে সুপারভাইজার ও ম্যানেজার হিসাবে কাজ করবেন।....." ব্রিটেনের প্রতিনিধি এককভাবে আরও মন্তব্য করেন : "...অনেক ক্ষেত্রে এমন সন্দেহ রয়েছে যে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটি হয় মেধা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর নিরিখে।"

পশ্চিম জার্মানীর প্রতিনিধির মন্তব্য :

"...ভারতের ছাত্ররা জানেই না যে, যে পথ তারা নিয়েছে তা তাদের কোথায় নিয়ে যাবে। শিক্ষকদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও হয় নেই, নয় যৎসামান্য। একটা চাপানো সিলেবাস অনুযায়ী তাদের পড়াতে হয় তাতে পরিস্থিতি বিশেষে সে সিলেবাসের কোন মাথামুণ্ডু থাক আর নাই থাক।"

জাপানী প্রতিনিধির মন্তব্য :

"...আমি যে সব ইনস্টিটিউট দেখেছি সেগুলি প্রায় সবই স্থাপিত হয়েছে পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশের অর্থে, পরীক্ষার যন্ত্রপাতিও এসেছে ঐ সব দেশ থেকে।...

পলিটেকনিকগুলির যন্ত্রপাতি অতি সাধারণ—ভাল কাজের প্রায় অনুপযুক্ত এবং সেগুলি ব্যবহার হয় বলেও মনে হয় না।...এর সঙ্গে ভাষার সমস্যা যুক্ত হয়ে সমস্যাকে জটিল করেছে।...কিছু কিছু ছাত্রের ইংরেজীর প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও থাকে না এবং পড়ানোও ভালভাবে এগোয় না।...প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার মানও নীচু মনে হয়।...

"বড় এবং ছোট নানা কারখানা আমি দেখেছি। সবগুলিই বেশ ভাল অবস্থায়। মনে হয় আমার পরিদর্শনের জন্য বাছাই করা। আমার মনে হয়েছে যে ভারতীয় শিল্প কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নত দেশের কারিগরী প্রয়োগ করে বেশ কিছুটা উন্নতি করতে পেরেছে। কিন্তু কারিগরী সংস্থান প্রথম শ্রেণীর হলেও সর্বত্র যে সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়েছে এমন নয়—যখন তখন সেগুলি অকেজো হয়ে পড়তে পারে এবং উৎপাদিত পণ্যের মানও উঁচু নয় কিন্তু কর্মীদের মধ্যে সর্বত্র একটা

প্রচণ্ড প্রয়াস দেখেছি যত দ্রুত সম্ভব উন্নত দেশের সমকক্ষ হবার। শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও অবস্থা একইরকম।

"অন্য পলিটেকনিকগুলির তুলনায় প্রাইভেট পলিটেকনিকগুলিতে 'স্যাণ্ডউইচ' বা মিশ্র কোর্সের চল বেশী মনে হয়েছে। দুভাবে এটা করা হয়ে থাকে, একটি ক্ষেত্রে একজন কারখানা ম্যানেজার একটি শিক্ষালয় স্থাপন করে, অপরক্ষেত্রে একজন বিদ্যালয় ম্যানেজার লাভের জন্য একটি কারখানার মালিক হয় ও চালায়।…

"বর্তমানে শিল্প, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিকগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার জন্য ভারতে একটি শিক্ষা সংক্রান্ত সমন্বয় সংস্থা স্থাপিত হোক এই আমার প্রস্তাব।…"

উপসংহার :

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফললাভ যে হয়নি তার মৌল কারণ হোল অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিল্পায়ন, কারিগরী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা—এইসব সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সুসংহত চিন্তা ও কাজের অভাব। একদিকে যদি পরিকল্পনা করা হোল সর্বস্তরের কারিগরী শিক্ষার দ্রুত প্রসার; তবে অন্যদিকে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য করা হতে লাগল নির্বিচারে কারিগরী আমদানী। কৃষি সম্পর্কিত শিল্প যদিবা কিছু গড়ে উঠল তা হোল এদেশের কৃষকদের প্রয়োজনের তোয়াক্কা না করেই। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীকে "আধুনিক ও উন্নত" করা হয় শিক্ষক ও শিক্ষাদান পদ্ধতির কথা ভুলে গিয়ে। এ অবস্থা আমরা কতদিন বরদাস্ত করে চলব সেটাই প্রশ্ন।

সারণী—২

বিভিন্ন কারিগরী কাজে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে শতকরা কত অংশের কিরকম শিক্ষাগত মান

শিল্প	শতকরা অনুপাত		
	ইঞ্জিনীয়ারিং স্নাতক	ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত	হাতেকলমে ইঞ্জিনীয়ার* (Engineering practicals)
যন্ত্রশিল্প	১১	৪১	৪৮
বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি	১৬	৩৮	৪৬
ধাতু ও খনি	৯	৩৭	৫৪
প্রসেসিং শিল্প (রাসায়নিক ইত্যাদি)	২৩	২৪	৫৩
অন্যান্য শিল্প	২৬	২৯	৪৫
সব মিলিয়ে (গড়)	১৬	৩৬	৪৮
…	…	…	…
কারিগরীকাজে নিযুক্ত (গড়)	৪৯	৮৩	৭৬
উচ্চপদস্থ অফিসার (গড়)	৫১	১৭	২২

* যারা অভিজ্ঞতা সম্বল করে কারিগরী কাজ করে কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা নেই

দ্রঃ বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র মিলিয়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মোট প্রায় ১৩০টি শিল্প থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

সূত্র : "(Report of the Special Committee on Re-organisation and Development of Polytechnic Education in India, 1970-71)" (Chairman : G. R. Damodaran)

সারণী—১ : পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী শিক্ষা (৩-৫ কলমের সংখ্যাগুলি নিকটবর্তী ৫-এর গুণিতকে দেখানো হয়েছে)

১	২				৩				৪				৫			
বছর	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা				অনুমোদিত ভর্তি ক্ষমতা (সংখ্যা)				প্রকৃত ভর্তি (সংখ্যা)				উত্তীর্ণ (সংখ্যা)			
	ক	খ	গ	ঘ	ক	খ	গ	ঘ	ক	খ	গ	ঘ	ক	খ	গ	ঘ
১৯৫০	৫	৮	৫	০	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৬০	৫	১০	২০	৪	৩২৫	১৫০০	২৮৫০	২৫০	১০০	১১০০	২৮৭৫	—	২২৫	৭০০	১২৫০	—
১৯৭০	৭	১৩	২৮	২০	৫৫০	২০০০	৫৪০০	১২০০	—	—	—	—	৬৩০	২০৭৫	৩৭২০	৩৮০
১৯৭২	৭	১৩	২৮	২০	৬৫০	১৯৫০	৫৪০০	১২০০	৫৫০	১৭০০	৩০০০	৪০০	৪০০	১৫৫০	১৪০০	২০০
১৯৭৪	৭	১৩	২৮	২০	৭৫০	২০০০	৫৪০০	১২০০	৫৫০	২১০০	৩৮০০	৮০০	৪৩০	১৬০০	১১০০	১৫০
১৯৭৬	৭	১৪	২৮	২০	৭৫০	২০০০	৫৫০০	১১০০	৫৩০	২১০০	৪০০০	*	২৭০	১১০০	২০০০	২২০
১৯৭৮	৭	১৪	২৮	২০	৭৫০	১৯০০	৪৩০০	১১০০	৫৬০	১৯০০	৩৩০০	৬০০	৩০০	১১০০	১৭৫০	২০০

দ্রঃ ক, স্নাতকোত্তর, খ, স্নাতক (ডিগ্রী) গ, পলিটেকনিক (ডিপ্লোমা) ঘ, জুনিয়ার ডিপ্লোমা / টেকনিক্যাল স্কুল, — চিহ্নিত সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় নি।

* অক্টোবর ১৯৭৫-এ সরকারী এক বিজ্ঞপ্তিতে জুনিয়ার ডিপ্লোমা স্কুলগুলিতে ছাত্র ভর্তি বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়, উচ্চমাধ্যমিক বৃত্তিমূলক স্কুলে সেগুলিকে পরিণত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা পরে কার্যকর করা হয়নি।
(শ্রমমন্ত্রকের অধীন আই. টি. আই. গুলির হিসেব এর মধ্যে নেই)

সূত্র : ভারত সরকারের শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় অফিসকৃত "Facilities for Technical Education in Eastern Region" শীর্ষক বিভিন্ন বছরের সমীক্ষা রিপোর্ট।

রবীন মজুমদার, ফলিত রসায়ন বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিকসঃ একটি প্রতিবেদন

[The nature and background of scientific activities at the Saha Institute of Nuclear Physics are discussed briefly. It is observed that there has been a deterioration in the atmosphere of work in the Institute during the seventies as compared with the fifties and early sixties. This is correlated with the usurpation of administrative power by a clique alienated from the majority of the scientific workers of the institute. A few examples of the activities of the clique are presented.]

সাহা ইনস্টিট্যুট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানত মেঘনাদ সাহার প্রচেষ্টায়। সাহা ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের পদে আসীন ছিলেন। আবার সেই সঙ্গে তিনি ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সাহা ইনষ্টিট্যুটেরও পরিচালক ছিলেন। অবশ্য সংস্থাটির নাম 'সাহা' ইনস্টিট্যুট রাখা হয় তিনি মারা যাওয়ার পর। সংস্থার ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৮ সালে। আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্থাটির উদ্বোধন করেন মাদাম ইরিন জোলিও কুরী ১৯৬০ সালের ১১ই জানুয়ারী।

এই সংস্থায় পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ হয়। গবেষণার ক্ষেত্রে সংস্থাটিতে বর্তমানে যে বিভাগগুলি রয়েছে সেগুলি হল (১) মাস স্পেক্ট্রোস্কপি অ্যাণ্ড আইসোটোপ সেপারেশন (২) সাইক্লিক অ্যাকসিলারেটর (৩) ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক জেনারেটর (৪) নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (৫) ক্রিস্টালোগ্রাফী অ্যাণ্ড মলিকিউলার বায়োলজি (৬) থিওরেটিকাল নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (৭) নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি (৮) ইনস্ট্রুমেণ্টেশন (৯) বায়োফিজিক্স (১০) ডিরেক্টর্স রিসার্চ গ্রুপ। এছাড়া রয়েছে ওয়ার্কসপ, লাইব্রেরী, প্রশিক্ষণ বিভাগ বা টিচিং ডিভিশন, ও বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগ। প্রশিক্ষণ বিভাগে স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদেরকে এক বছরের একটি 'পোস্ট-এম এস. সি অ্যাসোসিয়েটশিপ কোর্স' পড়ানো হয়। এর জন্য প্রতিবছর ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এই ইনস্টিট্যুটে ভর্তি হন।

সাহা ইনস্টিট্যুট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স একটি স্বশাসিত গবেষণা সংস্থা। ১৯৫১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে গৃহীত ও পরে সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী এটি পরিচালিত হয় এক পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা। এই পরিচালকমণ্ডলীতে থাকেন সংস্থার ডিরেক্টর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি, ইত্যাদি। এই ইনস্টিট্যুটের ব্যয় নির্বাহ হয় প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পারমাণবিক শক্তি বিভাগ (ডি-এ-ই) থেকে বরাদ্দ অর্থ থেকে, আর অংশতঃ রাজ্য সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং অন্যান্য কিছু ব্যক্তি ও সংস্থা থেকে পাওয়া অনুদান থেকে। ইনস্টিট্যুটের ১৯৭৫ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ডি-এ-ই থেকে পাওয়া বরাদ্দের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা, আর রাজ্য সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ও ৩৪ হাজার টাকা। ডি-এ-ই'র বরাদ্দের মধ্যে মূলধনী খাতে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। বার্ষিক রিপোর্টে উদ্ধৃত ব্যয়ের হিসাবে মূলধনী খাতে ব্যয়ের কোন তালিকা দেওয়া নেই। চলতি খাতে ব্যয়ের মধ্যে কর্মীদের বেতন, ভাতা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ইত্যাদিতে ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৭৫ সালে ছিল প্রায় ৩৬·৪ লক্ষ টাকা। আর অমূলধনী জিনিষপত্র কেনা, প্রশাসনিক ব্যয়, ইত্যাদি বাবদ খরচের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫·২ লক্ষ টাকা।

১৯৭৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ইনস্টিট্যুটের সব ধরনের কর্মী, গবেষক ও ছাত্রের সংখ্যা মোট ৩৭৫ মত। এঁদের মধ্যে প্রায় ১৯ শতাংশ হলেন বিভিন্ন স্তরের (প্রফেসর, রীডার, লেকচারার ইত্যাদি) শিক্ষক, ১৮ শতাংশ গবেষক ও ৫ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিবিদ ও কারিগর। এছাড়া টেকনিশিয়ান, ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্টাণ্ট ও কারিগরী কাজে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সহায়ক কর্মীর সংখ্যা মোট কর্মীর প্রায় ২৩ শতাংশ, সাধারণ 'হেল্পার' ও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ২৩ শতাংশ, এবং অন্যান্য ধরনেব প্রশাসনিক কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৭ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য এখানে সংযুক্ত করা যেতে পারে। তা হল, গত প্রায় দশ বছরে এই ইনস্টিট্যুটের মোট কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। আর তার মধ্যে আবার গবেষক-শিক্ষক-প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যা বেড়েছে অত্যন্ত কম। তার বদলে, গবেষণা ও প্রযুক্তির কাজে অপ্রয়োজনীয়, মাথাভারী প্রশাসনের কাজে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে বেশী। ১৯৭৩ সালে মোট কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩৯৩, আর ১৯৭৫ এ সেই সংখ্যা আরো কমে হয়েছিল ৩৭৫। গবেষক বৃত্তিধারীর সংখ্যা ১৯৭৩ এ ছিল

৫৪ আর ১৯৭৫ এ ৫১। ইনস্টিট্যুটে কোন গোপনীয় বা 'ক্লাসিফায়েড' কাজ হয় না। অথচ এর 'সিকিউরিটি' বিভাগের কর্মীর সংখ্যা ১৯৭৫ এ ছিল ৩৩—শিক্ষকদের মোট সংখ্যার চাইতে বেশী। এই তথ্যগুলি সংস্থাটির পরিচালননীতির অভিমুখ সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরে। পরে এ নিয়ে আরো কিছু আলোচনা করা হবে।

১৯৫৫ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত কয়েকটি বছরে এই ইনস্টিট্যুট থেকে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা নিচের ছকে উপস্থিত করা হল।

ছক : কয়েকটি বছরে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা

বছর :	১৯৫৫	১৯৫৮	১৯৬০	১৯৬৫	১৯৭০	১৯৭৩	১৯৭৫
সংখ্যা :	২০	২৮	৫১	৫৩	৪২(৩৯)	৫৪(৬)	৪৭(৮)

বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যাগুলি বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোসিয়াম ইত্যাদিতে পঠিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা সূচিত করছে। শুধু গবেষণা-পত্রের সংখ্যা দিয়ে গবেষণার মান বা পরিধি সম্পর্কে কোন ধারণা করা যায় না। তবু লক্ষণীয় যে '৬০ এর দশকে সংস্থা থেকে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়লেও, '৭০ এর দশকে বিশেষ বাড়েনি, বরং প্রবণতা যেন একটু কমার দিকেই। সংস্থায় যথেষ্ট উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান বহু শিক্ষক-গবেষক-ছাত্র থাকা সত্ত্বেও এ ঘটনা আঙ্গুল দেখায় পরিচালননীতির মৌলিক ভ্রান্তির দিকেই।

সংস্থায় কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে গবেষণার মান সম্পর্কে যতটুকু মূল্যায়ন করা গেছে তাতে মনে হয়েছে যে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে, বিশেষত সত্তরের দশকে, সংস্থাটির পরিচালনব্যবস্থা ক্রমশ কর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপর থেকে চাপানো একটি প্রশাসনে পরিণত হয়েছে, এবং এর ফলে সংস্থায় গবেষণার আবহাওয়া ও মানসিকতা ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে সংস্থার কর্মীরা যথেষ্ট উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। এই সময়ে সাহা ইনস্টিট্যুটে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণার কাজ হয়েছিল যার মধ্যে কয়েকটি ছিল আন্তর্জাতিক মানে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) সাইক্লোট্রন : মূল অংশগুলি বিদেশ থেকে আনা হলেও সেগুলিকে একত্রে সংশ্লিষ্ট বা 'অ্যাসেম্‌ব্লী' করা, এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রাংশ তৈরীর কাজ সমাধা করেছিলেন এই সংস্থার একদল বিজ্ঞানকর্মী।

(খ) ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ : দেশী কারিগরির সাহায্যে একটি কম শক্তির ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নির্মাণ করেন একদল কর্মী। পরে অবশ্য বেশী শক্তির ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে বিভিন্ন জীবাণুর গঠন নির্ণয় এবং থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যান্সার চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত গবেষণা হ'য়েছে এই ইনস্টিট্যুটে।

(গ) ইউরেনিয়াম ২৩৫ পরমাণুর বিভাজন বা 'ফিসন' এর সম্ভাব্যতা পরীক্ষাগারে মাপা হয়। গবেষণাটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে ঐ সময় পরিমাপটি প্রকাশ্যভাবে অন্য কোন সূত্র থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ যে যে দেশে এর আগে এই পরিমাপ করা হয়েছিল সেই সেই দেশ সামরিক কারণে তথ্যটিকে গোপন রেখেছিল।

(ঘ) নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনান্স (পরমাণু কেন্দ্রকের চৌম্বক অনুনাদ) বা এন-এম-আর : এন-এম-আর আজকের দিনে পদার্থ-বিজ্ঞানে একটি বহুল ব্যবহৃত প্রক্রিয়া। এটি অবিষ্কৃত হয় ১৯৫০ সালে। এর কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে সাহা ইনস্টিট্যুটের একদল কর্মী একটি এন-এম-আর স্পেক্‌ট্রোমিটার তৈরী করেন। এই দলটি পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রশিক্ষিত তরুণ কর্মীদের সহযোগিতা ও উদ্যমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এঁরা 'স্পিন ইকো' সংক্রান্ত যে কাজটি করেন তা ছিল ঐ সময়ে একটি প্রথম সারির মৌলিক কাজ। এছাড়া এন-এম-আর এর উপর এই দলটি আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন।

(ঙ) পরমাণুকেন্দ্রকের গঠন সংক্রান্ত তত্ত্বীয় কাজ : পঞ্চাশের দশকে পরমাণুকেন্দ্রকের গঠন অনুধাবনের ক্ষেত্রে বহুকণাতত্ত্ব বা 'মেনি বডি থিওরী'র প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন দেশে দ্রুতহারে গবেষণার অগ্রগতি ঘটতে থাকে। পশ্চিমী দেশগুলিতে এই সময় গবেষকরা বড় বড় যন্ত্রগণক বা কমপিউটরের সাহায্য নিয়ে কেন্দ্রকের গঠন সংক্রান্ত নানা জটিল গণনা সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করেন। সাহা ইনস্টিট্যুটের একদল কর্মী এক তরুণ শিক্ষকের নেতৃত্বে ঐ সময় এই ধরনেরই কিছু গণনা করেন, কিন্তু বড় যন্ত্রগণকের সাহায্য না নিয়ে, কারণ উপযুক্ত যন্ত্রগণক তখনো এদেশে বসে নি। যে আত্মবিশ্বাস ও উদ্যম নিয়ে তাঁরা ঐ সময় যন্ত্রগণকের সাহায্য ছাড়াই ঐ ধরনের গবেষণার কাজ হাতে নিয়েছিলেন তা পরবর্তী সময়ে ক্রমশ বিরল হয়ে এসেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে এই ইনস্টিট্যুটে যে বিজ্ঞানকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন বিদেশে।

পঞ্চাশের দশকের ধারা ষাটের দশকের প্রথমার্ধেও অনেকটা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তারপর থেকে প্রতিষ্ঠানটির ভিতর কাজকর্মের আবহাওয়ায় ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে কার্যকর ক্ষমতা ক্রমশ গুটিকয়েক ব্যক্তি কুক্ষিগত করতে শুরু করে। গবেষণার প্রসার তথা মান উন্নয়নের বদলে নিজেদের ক্ষমতা বজায়

রাখাই এদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষক-গবেষক-বিজ্ঞানকর্মীদের সঙ্গে প্রশাসনের যোগসূত্র শিথিল হতে হতে ক্রমশ অনেকটা বৈরিতা-মূলক সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন প্রকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করার ব্যাপারে একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে থাকে গুটিকয়েক ব্যক্তির একটি চক্র। কর্মীদের উপর বিভিন্ন ধরণের দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটর বসানোর সময় ইনস্টিট্যুটের কয়েকজন কর্মী-গবেষক একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়ায় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সমস্ত গবেষককেই কমপিউটরের সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই ব্যবস্থা রদ করার জন্য গবেষক-কর্মীদের আন্দোলনের শরণাপন্ন হতে হয়। উচ্চপদস্থ অধ্যাপকরাও ক্ষমতাবান চক্রটির বিষনজর থেকে রেহাই পান না। পাঁচজন খ্যাতনামা অধ্যাপককে একবার প্রায় বিনা কারণেই কর্তৃপক্ষ হুমকি দিয়ে চিঠি দেয়। সারা রাজ্যে সত্তরের দশকের গোড়ায় যখন দমন-পীড়নের আবহাওয়া চলছে তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বেশ কিছু কর্মীর প্রমোশনের সময় তাঁদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক অপরাধের স্বীকৃতি সম্বলিত মুচলেকা চাওয়া হয়, এবং অনেক কর্মী অসহায়তা-বশত সে মুচলেকা দিতে বাধ্য হন। এছাড়া নানাভাবে কর্মীদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়। কর্মীদের মধ্যে হতাশা, উদ্যমহীনতা, তিক্ততা ইত্যাদি বাড়তে থাকে।

সম্প্রতি সাহা ইনস্টিট্যুটের বিভিন্ন বিভাগকে সল্ট লেকে নতুন প্রাঙ্গণে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেক কর্মীর মতে, নতুন জায়গায় উঠে যাওয়ার পর সাহা ইনস্টিট্যুটের উপর ডি-এ-ই'র প্রভাব বাড়বে ও এর পরিচালনব্যবস্থা আরো স্বৈরতান্ত্রিক ধরনের হয়ে উঠবে।

প্রশাসনিক গলদের ফলে বর্তমানে সাহা ইনস্টিট্যুটের একাধিক প্রকল্প অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে। কয়েকটির কাজ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। কয়েকটি প্রকল্প তাড়াহুড়ো করে নেওয়া হয়েছে যাতে বিশেষ কিছু ব্যক্তির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়ে, অথচ সেগুলি সম্পূর্ণ করার মত কোন ব্যবস্থা বা পরিকল্পনাই নেওয়া হয় নি। হিলিয়াম তরলীকরণ যন্ত্র কেনা হয়েছে, কিন্তু সেটিকে ঠিকমত বসিয়ে কাজ চালু করা হচ্ছে না। বছরের পর বছর যন্ত্রটি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। এটিকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটির সাহায্যে হওয়া সম্ভব। 'লেসার প্লাজমা' প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে অথচ তার জন্য কার্যকর কোন প্রস্তুতিই নেওয়া হয়নি। যে ব্যক্তির নামে প্রকল্পটি মঞ্জুর হয়েছে তিনি শিগগীরই অবসর নেবেন। এই প্রকল্পটি এবং প্লাজমা ফিজিক্সে আরো কয়েকটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য, প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই। ক্ষমতাসীন চক্রের এক সদস্যের অধীনে নিউট্রনের জোরালো উৎস ('ইনটেন্স নিউট্রন সোর্স') তৈরীর একটি প্রকল্প বহুদিন ধ'রে বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবায়িত হয় নি। এ ছাড়া আরো কয়েকটি প্রকল্পের নাম করে দামী দামী যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে ইনস্টিট্যুটের ভিতরকার বিজ্ঞানকর্মীদের সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করেই, অথচ কেনার পর যন্ত্রগুলি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকছে।

সাহা ইনস্টিট্যুট পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। কিন্তু এটি পরিচালিত হচ্ছে যে নীতিতে তা বিজ্ঞান গবেষণার প্রসার বা উন্নয়নের সম্পূর্ণ বিরোধী। ফলে অন্যান্য আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের মতই সাহা ইনস্টিট্যুটও আজ জনসাধারণের উপর একটি ভারী বোঝায় পরিণত হতে বসেছে।

সূত্র ঃ

(১) সাহা ইনস্টিট্যুটের বিভিন্ন বছরের বার্ষিক রিপোর্ট।

(২) সাহা ইনস্টিট্যুটের 'অ্যাডভাইসরি কমিটি'র তরফ থেকে পরিচালকমণ্ডলীর প্রধানকে প্রদত্ত ৩১৮০ তারিখের স্মারকলিপি।

(৩) ইনস্টিট্যুটের বিভিন্ন কর্মীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় প্রাপ্ত মতামত।

অভিজিৎ লাহিড়ী

বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ

বিজ্ঞানকর্মীদের নাটকে নিষেধাজ্ঞা

ফিজিকাল রিসার্চ লেবরেটরীর এফ, আর, এস ডিরেকটর অবশেষে পুলিশের শরণাপন্ন হলেন। এমনকি আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী যে নাটক মঞ্চস্থ করা আইনী বলে ঘোষিত হয়েছে সেই নাটকটি মঞ্চস্থ করার বিরুদ্ধে পুলিশ নিয়োগ করলেন বিজ্ঞানী প্রশাসক। নাটকটির নাম 'জনার্দন যোশেফ'—মঞ্চস্থ করেছেন ফিজিকাল রিসার্চ লেবরেটরীর বিজ্ঞান কর্মীরা। নাটকের বিষয়বস্তু হল কেমন করে জনার্দনের মত সৎ বিজ্ঞানকর্মীদের আত্মাহুতি দিতে হচ্ছে স্বৈরাচারী কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার যূপকাষ্ঠে। নাটকটির শেষে দেখান হচ্ছে কেমন করে সংগঠিত প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে বেরিয়ে আসছেন যোশেফ। এই বিষয়বস্তু ফিজিকাল রিসার্চ লেবরেটরীর কর্তৃপক্ষের গোসার কারণ হয়েছে—নানাভাবে তাঁরা নাটকটি মঞ্চস্থ করার বিরোধিতা করছেন।

সমস্যা ঃ প্রথম পাঠ

[Some problems of teaching the Bengali alphabet and first words to children are reviewed in the background of the current controversy on the topic. It is felt that the need of a movement to integrate all people interested in teaching with the process of introducing children to language far outweighs that of a uniform text-book.]

বাংলা পড়তে শেখা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে ভালোই হয়েছে। বেশ কিছু সমস্যা আছে যা দূর থেকে চোখে পড়ে না। আলোচনা চলতে চলতে এই সমস্যাগুলোও বার হয়ে আসছে।

সমস্যাগুলোকে দুটো মোটা ভাগে ভাগ করা যায়। কী পড়ানো হবে আর কী ভাবে পড়ানো হবে।

সাবেকী কায়দায় এগোনো হ'ত কয়েকটা বিশেষ ধাপ ধরে। প্রথমে আসতো অক্ষর পরিচয়। বর্ণমালা চেনা সাঙ্গ হলে অক্ষর জুড়ে কথা বানানো শুরু হ'ত। আসতো 'আ'-কার, 'ই'-কার জোড়ার পালা। সব শেষে কথা জুড়ে ছোটো ছোটো বাক্য তৈরী হ'ত। এই কায়দাই চলেছে 'বর্ণ পরিচয়' বইতে। 'সহজ পাঠ' বা 'হাসিখুসী'ও ধরেছে একই পথ।

তবে 'বর্ণ পরিচয়' অংকের নিয়মের মতো সোজাসুজি একের পর এক শান বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙে চলেছে। কথাগুলোও এমন যে শিশু কেন তার শিক্ষকও অনেক সময় মানে জানেন না। সেখানে 'সহজ পাঠ', 'হাসিখুসী' ছড়ায়, ছবিতে, ছবির মতো কথায় কঠিন ধাপে বিছিয়ে দিয়েছে গালিচা। অবশ্য 'হাসিখুসী' নেহাতই হেলতে দুলতে পড়া-পড়া খেলতে খেলতে শিখতে শুরু করার বই। 'সহজ পাঠ' সাহিত্য। 'হাসিখুসী'র ছক ধরে আরো আরো ভালভাবে ছাপা, রং-চঙে অনেক বই এসেছে বাজারে! একটু ভিন্ন স্বাদের বইও লিখেছেন সুখলতা রাও ও তাঁর অনুসারীরা।

পশ্চিমী দুনিয়ায় ধাপগুলোকে বদলে দেওয়া হয়েছে। কোনো জিনিস বা কাজের ছবির সাথে মিলিয়ে পাতায় পাতায় হাজির করা হয় শিশুর চেনা কথা, ছোটো ছোটো বাক্য। ছবির সাথে মিলিয়ে শিশু অক্ষরের বিশেষ বিশেষ দল চিনতে শেখে অক্ষর শেখার আগেই। মানে, a, b, c, d শেখার আগেই ছবি দেখে cat, ball, ship— এ ধরনের অক্ষর সমষ্টির উচ্চারণ শেখে। কথা ও ছোটো ছোটো বাক্য শেখার ভিতর দিয়েই প্রথমটায় অক্ষরের ধারণা গড়ে ওঠে। পরে বোঝে আলাদা আলাদা অক্ষরের উচ্চারণ ও কী ভাবে তাদের জুড়ে কথাগুলো তৈরী হয়েছে। নতুন প্রথম ভাগের দরকার বোঝাতে গিয়ে অনিলা দেবী এই নয়া ধাঁচের উল্লেখ টেনেছেন।

বলা বাহুল্য, পুব-পশ্চিমের কায়দার অবিকল নকল করাটা বিজ্ঞান-সম্মত হবে না। আমাদের ভাষা ও আমাদের সমস্যার বিশেষ রূপটি মনে রাখতে হবে। ধরা যাক cat, ball, ship, I drink milk থেকে a, b, c, d-তে যাওয়ার রাস্তার কথাই। বাংলা ভাষায় এই রাস্তা কাটা সহজ নয়। বাংলা স্বরধ্বনি তো কেবল অক্ষর জুড়ে আসে না। স্বরচিহ্নের ব্যবহার শিখতে হয় আলাদা করে। কথা আর বাক্য থেকে অক্ষর ও তার চিহ্নে পৌঁছানোর সমস্যা সহজ নয়।

এতো গেল একটা বেশ বড়ো ব্যাপার। আরো ছোটো ছোটো কতো বাধা আছে। হসন্ত আর 'অ'-কারান্ত ধ্বনির তফাৎ শিশুকে হোঁচট খেতে বাধ্য করায় একেবারে গোড়াতেই। 'ক-ল' হ'ল 'কল্' 'ক-ম' হ'ল 'কম্'। 'ক-র'-কে 'কর্' বলেও রেহাই পাওয়া যায়, পালানো যায় না 'কত'-র মতো শব্দের হাত থেকে। 'ক-ত' তো 'কত্' নয়, নেহাতই 'কতো'। যখন শিশু গোড়ার দিকে অক্ষর জুড়তে শিখছে তখন দু' ধরনের উচ্চারণের ধাঁধা এড়ানোর কথাও অনিলা দেবী আলোচনা করেছেন।

বাংলা বর্ণমালার অদলবদল নিয়ে নানা গুণীজন নানা মত প্রকাশ করেছেন অনেক দিন ধরেই। 'ঋ' উঠে গেছে আমাদের ছেলে-বেলাতেই। এখন দেখি 'ঃ'কেও মাঝে মাঝেই বাদ দেওয়া হয়। খুবই ভালো। 'ঈ', 'ঊ' আর 'ী'-কার, 'ূ'-কারের বৈশিষ্ট্যও সাধারণ বাঙালীর উচ্চারণে ধরা পড়ে না। 'য' বাদ দেওয়া যায় সহজেই। 'শ' আর 'ষ' বর্ণের উচ্চারণে কী তফাৎ আমরা করি?

এগুলো সব বাদ দিলে থালি যে বানান সরল হবে তাই নয়। হ্রস্ব-'ই', দীর্ঘ-'ঈ', হ্রস্ব-'উ', দীর্ঘ-'ঊ', দন্ত্য-'স', তালব্য-'শ' এই-ভাবে বলে বলে অক্ষর চিনলে, অক্ষর জুড়ে উচ্চারণের বেলায় মুস্কিল ঘটে। 'ক-ল' 'কল' উচ্চারণে শিশু বেগ পায় না। কিন্তু 'ক-হ্রস্ব-ই' বললে 'কই' উচ্চারণ সাথে সাথে আসে না, ভেবে বুঝে করতে হয়।

একটাই 'ই' থাকলে বলা যেতো 'ক-ই'—তাহলে 'কই' উচ্চারণ আসতো স্বাভাবিকভাবেই।

আসলে 'হ্রস্ব-ই', 'তালব্য-শ' বলে বলে অক্ষর চিনলে 'ই' বা 'শ' বর্ণের উচ্চারণের ওপর জোরটা পড়ে না। অনেক সময়েই শিশু অক্ষরের নামটাই শেখে, ধ্বনিটা নয়।

'ৎ' অক্ষরটিরও দরকার নেই। তবে 'ৎ' দিয়ে কথা কম আসে বলে খুব একটা অসুবিধা হয় না। 'য়' নিয়েও সাবধান থাকা দরকার। গোড়ার দিকে 'শয়ন'-জাতীয় কথা দিয়ে 'য়'-কে আনাই ভালো। 'কয়', 'হয়' নিয়ে বড়োই ঝামেলা। 'ক-য়' যে 'কঅ' নয়, 'কয়্' এ ধারণাটা শিশুর কাছে একটু ঘোলাটেই ঠেকে।

বর্ণমালা বদলালে বেশ কিছু গোলমেলে বানান এমনিতেই পাল্টে যাবে। এ ছাড়াও আরো কিছু বানান পাল্টালে বাংলা শেখা আরো সহজ করা যেতে পারে। তবে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার যোগ অক্ষুন্ন রাখতে যাঁরা আগ্রহী সেই বৈয়াকরণেরা একমত হবেন না।

তর্কটা অবশ্য খুব জমেছে কী পড়ানো হবে তা নিয়েই। 'সহজ পাঠ' কেন, শিশুর যে কোনো বইতেই একটা বড়ো সমস্যা কথা আর বিষয় বাছা। শিশুর জগৎ থেকে তার প্রথম পড়ার বইয়ের কথা কতো দূরে থাকতে পারে তার একটা বড়ো উদাহরণ 'বর্ণ পরিচয়'।

'সহজ পাঠ', 'হাসিখুসী' ও এখনকার নতুন নতুন বইগুলিতে কথা, বিষয় সহজ হয়ে এসেছে। কিন্তু যে শিশুর কথা মনে রেখে কথা, বিষয় বাছা হয়েছে সে বাবুদের ঘরেরই শিশু, গ্রামের বা শহরের। ইদানীং শহুরে চাকুরেদের ঘরের ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভাবনার রেশ পাওয়া যাচ্ছে।

অক্ষর পরিচয়, অক্ষর জুড়ে কথা আর কথা জুড়ে বাক্য কার চোখে-মুখে-কলমে-পেন্‌সিলে ভাষা দেওয়ার জন্য? কী পড়ানো হবে তা জড়িয়ে আছে কাকে পড়ানো হবে তার সাথে। বস্তীর মেয়ে আর কিসানের ছেলের কাছে ভাষা পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প কি খাঁটি? তা হলে ভাবতে হয় এমন কথা আর এমন বিষয় নিয়ে যা তাদের জীবন থেকে উঠে আসছে। তবেই তো অক্ষর জোড়া, 'া'-কার, 'ি'-কার জোড়ার খেলা জীবন পাবে শিশুর মনে। কথার পরে কথা আবিষ্কার করার আগ্রহ বেড়ে উঠবে।

সাক্ষরতা বাড়ানোর অভিযানে উৎসাহী বিভিন্ন সংগঠন যে সব বই তৈরী করেছেন সেগুলিতে এই দিকে একটা চেষ্টা দেখা যায়। 'কলতলা', 'নর্দমার পাঁক সাফাই'—এ ধরনের বিষয় ঘিরে অক্ষর আর স্বরচিহ্ন জোড়ার পড়া চোখে পড়ে। এগুলো বস্তীর ছেলেমেয়েদের চেনা জীবন ও চেনা কথার কিছুটা কাছাকাছি এসেছে।

কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই বোঝা যায় আর একটা কথা। যদি সত্যিই শিশুর শোনা ও জানা কথা ও জীবনের জগৎ থেকে কথা বেছে বেছে পাঠ বানাতে হয় তবে বইয়ের গুরুত্ব অনেক কমে যায়। গ্রামের পাঠ একরকম হবে, শহরের হবে আর এক রকম। বস্তীতে যা হবে, বাবুপাড়ায় তা চলবে না। ভাগীরথী—হুগলীর কোলে যে রকমটি খাপ খাবে, জঙ্গল মহলে তার থেকে অন্য দিকে যেতে হবে।

এখানে বিভিন্ন এলাকার বিশেষ বিশেষ উপভাষার শব্দের প্রভেদের কথা ধরা হচ্ছে না। কেতাবী বাংলা কথাগুলোকেই ধরা যাক। এক এক এলাকায়, এক এক শ্রেণীর লোকের ঘরে এক এক বিষয় নিয়ে এক এক ধরনের কথা বেশী হয়। এলাকায় এলাকায়, আলাদা আলাদা অবস্থার মানুষের ঘরে ঘরে শিশুর জীবন আলাদা। 'বিশ্ব শিশু'র ধারণাটি অলীক, যেমন অলীক সমস্ত শিশুর এক ও অভিন্ন মনোজগতের কল্পনাটি। তাই বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুর পড়া শেখার কাজ একটা সাধারণ সরকারী বই দিয়ে পূরণ হতে পারে না।

তার মানে এটা নয় যে, আলাদা আলাদা অনেক বই লাগবে। আসলে ভালো বইয়ের থেকে বেশী জোর দিতে হবে ভালো শিক্ষকের উপর। শিক্ষককেই বাছতে হবে কথা আর বিষয় এলাকার মানুষের জীবন আর আকাঙ্ক্ষার জগৎ থেকে। এভাবে দেখলে অক্ষর পরিচয় আর বাংলা ভাষা শেখানোর কাজটিকে আর হেলাফেলার বিষয় করে রাখা যাবে না।

শিক্ষককে তাকাতে হবে ছাত্রের সমাজ জীবনের দিকে। ভাষার জালে ছেঁকে আনতে হবে হাসি কান্নার সারমর্ম। ধরতে হবে জীবনের বুনিয়াদী সুরগুলোকে। একাধারে ভাষাবিজ্ঞানী আর সমাজ বিজ্ঞানী এই যে শিক্ষক তাঁর ক্লাস ঘরে বাংলা শেখা হয়ে উঠবে এক অভিযান। বাংলার শিশুরা সেই শিক্ষকের অপেক্ষায় আছে, আর শিক্ষকদের সেই স্বাধীনতার আর সেই দৃষ্টিকোণের। বই চাই, কিন্তু একটা বই বানানো হাজার হাজার শিক্ষক বানানোর কাজের বিকল্প নয়।

বড়লোক অথবা শহুরে চাকুরের ঘরের ছেলেমেয়ে ঘরের আব-হাওয়ার প্রভাবে হয় আগ্রহে নয় চাপে পড়ে কিছু না কিছু পড়াশুনা শেখে বাধ্য হয়ে। যে সব ঘরের ছেলেমেয়ের ওপর সেই বাধ্যবাধকতা নেই, তাদের মনে বিশেষ আগ্রহ না জাগাতে পারলে, পড়া শেখাকে জীবন্ত, আনন্দময়, চিত্তাকর্ষক করে তুলতে না পারলে পাঠশালাতেই ধরে রাখা যায় না তাদের। তৈরী করা যায় না এমন কোনো খাত যার টানে জীবনের সব প্রতিকূল স্রোতও তাদের জীবন আর বই থেকে শেখার ধারা থেকে একেবারে আলাদা করে দিতে পারে না।

আর আগ্রহ জাগিয়ে রাখতে পারলে অল্প সময়ে অনেকটা শেখা যাবে। এ ব্যাপারটা ফেলনা নয় কারণ, আমাদের দেশের শিশুদের একটা বড়ো ভাগ স্কুল শিক্ষার আওতায় আসেই না বা এসেই ছিটকে যায়। আর যারা প্রথম পড়তে আসে তাদের মধ্যে বয়সের ফারাকও প্রচুর। মোট কথা, পড়তে যারা চায় তারা খুব অল্প সময়ই দিতে পারে পড়ায়।

আবার এই কারণেই স্কুল শিক্ষার বাইরে, শিক্ষার বাঁধাধরা চৌহদ্দির বাইরে না গেলে যাদের প্রথম ভাগ পড়া দরকার তাদের পাবেন না শিক্ষকেরা। এমন কি এটাও বলা চলে যে, প্রাথমিক শিক্ষার গোটা ব্যাপারটারই প্রধান জোর পড়া উচিৎ স্কুল শিক্ষার বাইরে। কেবল অল্প কিছু সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকের পক্ষে এতো বড়ো কাজে হাত দেওয়া অসম্ভব।

শিক্ষার সাথে যুক্ত বা শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী সমাজের সকল রকমের মানুষ যদি এই কাজে হাত লাগান অন্তরের তাগিদ থেকে তবেই এই বিপুল কর্মকাণ্ডের রথের চাকা নড়তে পারে। সরকারী ফতোয়ায় এমন কাজ হতে পারে না। দরকার সমাজের মধ্যে বড়ো রকমের একটা নাড়াচাড়া। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ভালো শিক্ষক, ছাত্র সযত্নে নিজের নিজের ফুলের টবে জল দিচ্ছেন। সেই লোক কোথায় যাঁরা সমাজের ফুল বাগানে জল দেবেন? কোথা থেকে আসবে সেই লোক—অচলায়তনের কোন্ জানলাটা খুললে? কোন্ দরজাটা ভাঙলে?

অবশ্য কী পড়ানো হবে তা নিয়ে যে বিতর্ক চলছে এ দিকটায় তা খুব ঘেঁষে নি। বিতর্কের বিষয়বস্তু দাঁড়িয়েছে—শিশুর মধ্যে কী মূল্যবোধের সঞ্চার ঘটবে প্রথম পাঠ থেকে। এ প্রসঙ্গে এখানে একটা কথাই বলার আছে। পাঠ্য বইতে ছাপার অক্ষরে যে কোনো মতামতের ছায়া পড়লেই ভিন্ন মতের লোকের কাছে তা একেবারেই অসহ্য ঠেকে। মনে হয় অমুক কথাগুলো বা অমুক বিষয় বাদ দিতে না পারলে বা ঢুকাতে না পারলেই দেশ রসাতলে যাবে। সত্যি কি এই ব্যাপারে পাঠ্য বইয়ের ভূমিকা এতোটাই? এ ব্যাপারেও কি পাঠ্য বইয়ের চেয়েও শিক্ষকের ভূমিকা অনেক অনেক বেশী নয়?

বই বদলানো সহজ। আরো সহজ বই না বদলানো। কঠিন সেই মানুষ তৈরী যে বইয়ের জ্ঞান আর বইয়ের মতকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ভবিষ্যতের মানুষদের মর্মে পৌঁছে দিতে সক্ষম, আগ্রহী, জাগ্রত।

—দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী

নিউক্লিয়ার নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে জাপান বিজ্ঞান সমিতির বিবৃতি

[The Japan Scientists' Association calls for an active world-wide movement for nuclear disarmament and holds up for emulation "three non-nuclear principles" that the JSA is trying to get incorporated into legislation in Japan. The call is linked particularly with the nuclear bombing of Hiroshima and Nagasaki and the plight and rights of the victims—the Hibakusha people. The call is translated from *Scientific World* (1980, 1), organ of the WFSW.]

[জাপান বিজ্ঞানী সমিতি (Japan Scientists' Association) জাপানের বিজ্ঞানীদের সর্ববৃহৎ বেসরকারী সংস্থা ও বিজ্ঞান-কর্মীদের বিশ্ব সম্মেলনের (World Federation of Scientific Workers) স্বীকৃত সংস্থা। বিজ্ঞানের সব শাখাতেই JSA-এর কর্মক্ষেত্র। জাপানে পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে আন্দোলন ১৯৫৪ সাল থেকেই শুরু হয়েছে—যখন Science Council of Japan (JSC) এ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণের চেষ্টা করে। তার পর থেকে জাপানে বিভিন্ন সংস্থা বহু আন্দোলন করেছে। বিশেষত সমস্যা হলো—হিবাকুশা (Hibakusha) অর্থাৎ যারা হিরোশিমা-নাগাসাকির বোমা বিস্ফোরণের পরে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের সত্যিকারের সাহায্য করা। JSA জাপান তথা বিশ্বের কাছে পারমাণবিক বোমার প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে সক্রিয় আন্দোলনের আহ্বান করেছে, সেটার বিবৃতি WFSW-এর মুখপত্র Scientific World (১৯৮০ সংখ্যা ১) থেকে এখানে অনুবাদ করা হোলো॥]

নিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিপদ আর নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে, প্রারম্ভিক বিন্দু হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ফিরে যাবো। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমা ফেলাটা একটা নিছক অতীতের বেদনাদায়ক ঘটনা বলে আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই। এটার তাৎপর্য বর্তমানেও খুবই বাস্তব ব্যাপার।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমা ফেলায় যে প্রথম পাঁচ মাসের মধ্যে দু'লক্ষ (১৯৪৫ সালের শেষে) আর পরবর্তী পাঁচ বছরে

আরও এক লক্ষ মানুষের প্রাণ গেছে, শুধু তাই নয়, এর বিধ্বংসী ফলাফল এখনও চলছে। শত-সহস্র পারমাণবিক-বোমা-আক্রান্ত মানুষ (হিবাকুশা) অবশিষ্ট রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে এখনো জীবিত তিন লক্ষ সত্তর হাজার মানুষের অবস্থা প্রতিদিন আরো খারাপ হয়ে চলেছে। আর বর্তমানে, বোমা ফেলার ৩৫ বছর পর, এখনও অনেক ব্যাপার আছে যেগুলোকে পারমাণবিক বোমার আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতি ও ফলাফল হিসেবে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের গ্রহণ করা দরকার; ঠিক কতজন প্রাণ হারিয়েছে, বোমা ফেলার ঠিক পরেই বিকিরণের মাত্রার বণ্টন, জেনেটিক ফলাফল, এবং মারাত্মক সামাজিক ধ্বংস ও অমানবিকতা; বাস্তবত গোটা ছবিটা এখনো নির্ধারণের দরকার আছে। এর সাথে, হিবাকুশাদের সত্যিকারের সাহায্য করাটাও নিশ্চয়ই যুক্ত করতে হবে। এখন যারা বেঁচে আছে তাদের শতকরা ৫০ ভাগ বোমা ফেলার পরে জন্মেছে, এবং এমন কি জাপানে তারাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা হিরোশিমা ও নাগাসাকি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়।

আমাদের আশু-কর্তব্যের সারসংকলন করা যায় এভাবে:

—জনসমক্ষে পারমাণবিক বোমার ক্ষয়ক্ষতি ও পরবর্তী তথ্য উদ্‌ঘাটন; প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে সমস্ত মানুষের মধ্যে জ্ঞান ছড়ানো;

—হিবাকুশাদের জন্য ঠিকমত সাহায্যের ব্যবস্থা করা; হিবাকুশাদের জাতীয় ক্ষতিপূরণের স্বীকৃতি দেওয়া; হিবাকুশাদের জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট সহযোগিতা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত এক বিশ্বের নিশ্চিতি তাদেরকে দেওয়া;

—প্রয়োজনীয় সমস্ত শাখার বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক ও আন্তর্বৈষয়িক সহযোগিতা দ্বারা এবং যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা দ্বারা এই কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সমস্ত আলোচনা ও আপস-মীমাংসা হিরোশিমা ও নাগাসাকির ঘটনাবলীর সাথে যুক্ত করা উচিত। রাজনৈতিক নেতা, সামরিক বাহিনী, কূটনীতিবিদ, চিন্তাবিদদের এই মনোভাবে পুনর্শিক্ষিত করে তোলা উচিত।

সমস্ত নিরস্ত্রীকরণের বিবেচনার মধ্যে, নিউক্লিয়ার নিরস্ত্রীকরণকে আমরা সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। প্রথমত, আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করা; দ্বিতীয়ত, নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্র, তার উৎপাদন, পরীক্ষা, সঞ্চয়, সংখ্যা-বৃদ্ধি ও বিস্তার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেলের কাছে এই বিষয়ে যে লিপি পাঠানো হয় তাতে জাপানের এগারো কোটি জনগণের মধ্যে দু' কোটির বেশী মানুষের স্বাক্ষর ছিলো।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন যেমন ঘোষণা করেছে, এটা এখন স্বীকৃত যে আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র গ্যারান্টি হলো নিউক্লিয়ার নিরস্ত্রীকরণ। নিরস্ত্রীকরণের দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন এবং প্রস্তাবিত বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনকে আমরা নিশ্চয়ই সফল করে তুলবো। অন্য কোনো পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

আমরা জাপানে "তিনটি নন্-নিউক্লিয়ার নীতি" বিধিবদ্ধ আইনের আওতায় আনতে চাইছি। জাপানের ভূ-খণ্ডে নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন, রেখে দেওয়া বা আমদানীর অনুমতি দেওয়া চলবে না। নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতকারী দেশের ভূখণ্ডের বাইরে এর বিস্তারকে কার্যকরীভাবে ঠেকাতে হলে, এই একই নীতিগুলিকে আন্তর্জাতিক করে তোলার সময় এসে গেছে। ন্যাটোর (NATO) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে নতুন এক জাতের মাঝারি ধরনের নিউক্লিয়ার মিসাইল, দ্বিতীয় পারশিং (Pershing—II), নিউট্রন বোমা ইত্যাদির বিস্তারের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক আন্দোলনগুলি সমেত ইউরোপ ও অন্যান্য দেশগুলির নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত আন্দোলনকে আমরা জাপানী বিজ্ঞানীরা অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করি। এগুলিকে থামানোর সময় এসে গেছে। আমাদের খুব দেরী হয় নি। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি, এ লড়াইয়ে আমরা জিততে পারবো।

আর একটা ব্যাপার বলা দরকার। অস্ত্রশস্ত্রের জন্য, বিশেষত নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের জন্য বিশাল অর্থব্যয় দ্বারা মানবিক সম্পদ ও সক্ষমতা, প্রধানত বিজ্ঞানী ও কারিগরদের কাজকর্ম বিপজ্জনক ভাবে নষ্ট করা হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির অপুষ্ট বিশ্বে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর দিকে যদি একে, বা এমন কি এর অংশ-বিশেষকে চালিত করতে পারা যেত, তাহলে আমরা শুধু মানবিক সম্পদের অনুৎপাদক, বাজে খরচবহুল ও বিপজ্জনক এই ব্যবহারের শেষই করবো না, বরঞ্চ আমাদের ব্যর্থতায় যে খোলাখুলি বেদনাদায়ক অধ্যায় মুখোমুখি হবে, তাকে প্রতিহত করবো। অনুবাদ: সৌমেন গুহ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা: তিন টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা:

সম্পাদক, **বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী**

C/o. ডি. এস. এণ্টারপ্রাইস

৫২/৯সি, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২

প্রসঙ্গ ঃ বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ

[The autocratic high-handedness of the R. K. Misson authorities of the V. C College, Rahara, in defiance of Government regulations and the W. B. College Teacher's Service Security Act is briefly exposed. The just demands of the struggling teachers are highlighted.]

একদিকে যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সম্মেলনে মানুষের অসীম সম্ভাবনার দ্বারখুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি শোনা যাচ্ছে তখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি রহড়ায় অবস্থিত বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ নামক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটিতে ধর্মীয় বর্মের আড়ালে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। সমস্ত সরকারী আইনকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, বাজারী সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৬৩ সালে সম্পূর্ণ সরকারী অর্থে বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ একটি গভর্নমেণ্ট স্পন্সর্ড কলেজরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি এড-হক কমিটি দ্বারা এই কলেজটি পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু থাকা কালে এই কলেজের একটি বিশেষ গঠনতন্ত্র কায়েম করা হয়। এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালন সমিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের ৩ জন প্রতিনিধি থাকলেও এই সংবিধান পরিচালন সমিতিকে যে বিশেষ কোন অধিকার দেয়নি তা স্পষ্ট হয় ডি. পি. আই -এর লেখা একটি চিঠি থেকে ঃ "এই কলেজটির পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে গভর্ণমেণ্ট স্পন্সর্ড কলেজের নিয়মানুযায়ী।" ১৯৭৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ কতকগুলি অসম্মানজনক হীন শর্ত শিক্ষকদের উপর চাপিয়ে দেয়। শিক্ষকদের 'মিশনের কর্মচারী' হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কোন প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শিক্ষকদের বয়েজ হোমের যে কোন প্রতিষ্ঠানে বদলি করা যাবে, তিন মাসের বিজ্ঞপ্তি সাপেক্ষে যে কাউকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা যাবে, কোন সংগঠন বা সমিতির সভ্য হতে হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে এবং কলেজ পরিচালন সমিতি রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমের অধীনে একটি উপসমিতি হিসেবে কাজ করবে। আশ্চর্যের কথা হল পরিচালন সমিতি নয়, মিশন বয়েজ হোম কর্তৃপক্ষ এই কলেজের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। দীর্ঘ ৩ বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিক্ষকরা ১৯৭৮ সালের ২০শে মে এই অসম্মানজনক শর্তাবলী প্রত্যাহার করাতে সক্ষম হন।

কিন্তু এতেও মিশন কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত হননি, কলেজ টীচার্স সারভিস সিকিওরিটি এ্যাক্ট ১৯৭৫-এর আওতার বাইরে থাকার জন্য স্বামী শিবময়ানন্দকে বেলুড় বিদ্যামন্দির থেকে বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজে বদলী করা হ'ল, তার মনোনয়ন করল রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ। অথচ বর্তমান আইন অনুযায়ী বেসরকারী কলেজে এবং গভর্নমেণ্ট স্পন্সর্ড কলেজে মনোনয়ন করার অধিকার একমাত্র সারভিস কমিশনেরই আছে। বর্তমানে মিশন কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত বেআইনী কার্যকলাপকে আইনী করে তোলার জন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধা-ভোগেরও আশা পোষণ করে। শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন ধরে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৮০ এর পর থেকে অবস্থান ও কর্মবিরতি করছেন। যদিও ১১ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে মিশন কর্তৃপক্ষের সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও শিক্ষকেরা ক্লাস নিচ্ছেন। যথাযথভাবে শিক্ষকদের দাবী হল ঃ বেআইনীভাবে নিযুক্ত অধ্যক্ষের অপসারণ, পরিচালন সমিতির (২১-১০-৭৮এ যার আয়ুষ্কাল শেষ হয়েছে) পুনর্গঠন, সারভিস সিকিওরিটি এ্যাক্ট অনুযায়ী শিক্ষকদের নিয়োগ প্রথা ও চাকুরীর নিরাপত্তা প্রণয়ন করা, সরকারী টাকায় তৈরী হোস্টেলটি অবিলম্বে ছাত্রদের স্বার্থে পুনরুদ্ধার করা, এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত আর্থিক ও প্রশাসনিক বেআইনী কাজকর্ম করেছে সেগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা।

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ এই সম্ভাবনাময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এর দিকে ঠেলে দিয়েছে, মিশন মার্কা গণতন্ত্রের বলি হয়েছেন বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাতে হলে অবিলম্বে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

পার্থ সেন
নরসিংহ দত্ত কলেজ।

রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট সংস্থার স্মারকলিপি

[Memorandum to the Chief Minister of West Bengal from the S.W.F. on the activities of the R. K. Mission in V. C. College, Rahara.]

"মুখ্যমন্ত্রী ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮০

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রিয় মহাশয় :

বোধহয় আপনি জানেন যে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব অধীনে শুধুমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষার একমাত্র স্নাতক কলেজ। আপনি এ ঘটনাও অবগত হতে পারেন যে, এই গভর্ণমেণ্ট স্পন্সর্ড কলেজের পরিচালকমণ্ডলী বিগত কিছু বছর যাবত সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ধ্বংস করে চলেছে। আমাদের আতঙ্কিত করে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ বেলুড় বিদ্যামন্দির থেকে জনৈক সাধুকে বদলি করে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের অধ্যক্ষ পদে বসিয়ে এখন কলেজ শিক্ষকদের চাকুরী নিরাপত্তা আইনের Service Security Act) ভিত্তিভূমিকেই চ্যালেঞ্জ করছে। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজকে ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান করে তোলার এবং তাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে সংবিধানের ২৬ এবং ৩০ নম্বর ধারার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। কর্মীবৃন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার সংঘর্ষ বর্তমানে অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

তাই আমরা দাবী করি: ধর্মীয় গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপমুক্ত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের উপযুক্তভাবে কলেজটিকে চালাবার জন্য এবং স্পন্সর্ড কলেজে প্রযোজ্য চাকুরীর নিয়মকানুন পালনের জন্য, সরকারের অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে—

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পক্ষে"

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ৫৭ জন গবেষক, শিক্ষক ও অন্যান্য বিজ্ঞানকর্মী স্বাক্ষর করেন। এই স্মারকলিপির স্বাক্ষরিত একটি কপি শিক্ষামন্ত্রীকেও পাঠানো হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে স্বাক্ষর সংগ্রহ এখনো চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পত্রিকা পর্যালোচনা

'মানুষ' পত্রিকা প্রসঙ্গে

[Following is a brief review of the monthly magazine "Manush". It is observed that the magazine uses scientific method in analysing social events, draws our attention to the traditional beliefs, myths & supersitions common in Indian society, introduces us to the life and ideals of the men from the History of Science, appraises the danger of modern defence research ; etc.]

পত্রিকাটির নাম 'মানুষ'। দাবী করা হয় "বিজ্ঞান সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।" 'মানুষ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য ও প্রবন্ধসমূহ পাঠে আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়ায় এই প্রসংগের অবতারণা। সামান্য দু'একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা পেশ করছি। যদি 'মানুষ'-এর মূল সুরটি ঠিকঠাক ধরতে পেরে থাকি তো মনে হয় এর মুখ্য উদ্দেশ্য আমাদের সমাজের নানান স্তরের মানুষের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার, কিংবদন্তী, কুপ্রথা, ধর্মের গোঁড়ামী-ভণ্ডামী ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং যুক্তি বুদ্ধি ও পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগে তার বিচার বিশ্লেষণ এবং স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। আমাদের ভারতীয় সমাজের নিস্তরঙ্গ প্রবাহে বহুদিন লালিত এই সমস্ত কুসংস্কার ও গোঁড়ামি। যুগযুগ ধরে থিতানো এই সমস্ত সংস্কার আমাদের সংস্কৃতির সাথে এমনভাবে সংপৃক্ত যে পুরানো সংস্কৃতির সাথে এই সংস্কারগুলিও ঐতিহ্যের গরিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেখানে হাত দেয় কার সাধ্য!

সেখানে হাত দেওয়া দূরে থাক নতুন কিছু বলারও কি জো আছে? না, নেই। কারণ "সবই 'ব্যাদে' আছে" এমন একটি ধারণার বাহক শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিচারে আমাদের সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষ। একজন ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ

Registration No. R. N. 34929/79 "Registered" Postal Regi. No. WB/CC 113

সাহা তাঁর কাজের সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ দিলে ভদ্রলোক বলেন "এ আর নতুন কি হইল, এ সমস্তই ব্যাদে আছে।" বেদের কোথায় আছে জানতে চাইলে ভদ্রলোক বলেন, "আমি ত কখনও 'ব্যাদ' পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমরা নূতন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবী কর সমস্তই 'ব্যাদে' আছে"। অথচ প্রফেসর সাহার ভাষাতেই "এই ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন"। ভদ্রলোকের উক্তির মধ্যকার 'আমার বিশ্বাস' শব্দ দু'টির মধ্যেই লুকিয়ে আছে পুরো সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ ওই ভদ্রলোকটি সেই দলের মানুষ যারা তাদের মনের দুয়ারে চিরতরে টাঙিয়ে রেখেছে যুক্তি-বিচার-বিবেক-বুদ্ধির 'নো-এনট্রি' ফলক। 'মানুষের 'আহরণ' শীর্ষক বিভাগে প্রফেসর সাহার নিজের লেখা থেকে সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই ঘটনাটি। এই বিভাগে আরও অনেকের লেখা থেকেই উদ্ধৃতি রয়েছে, যেমন আইনষ্টাইন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রিয়দারঞ্জন রায়, গোপাল ভট্টাচার্য, কার্ল সাগান প্রমুখ।

অন্যত্র দেখি লেখা হয়েছে 'ভোলেবাবা ও তাঁর ভূতানুচরেদের' তাণ্ডবলীলার বিবরণ। এও চলেছে সেই একই বিশ্বাসের অন্ধকার গলি বেয়ে। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের ভাষায় এদের "একটা দল হল আহাম্মক, তারা মনে করে অন্যায় অনাচার পাপ তাপ যাই কর মাথায় এক ঘটি জল ঢাললেই বাবা সব কিছু থেকে ত্রাণ করে দেবেন। আর একটি দল হল শয়তান। যারা যায় জনারণ্যে ঢুকে পড়ে চুরি ছিনতাই, ছ্যাচড়ামি, লোচ্চামি ইত্যাদি চালানোর একটি সুযোগ মিলবে বলে"। আবার এই বিশ্বাসের সুবাদেই অনেকেই মেনে নেয় ন্যাবা বা জন্‌ডিস রোগীর রোগ সারে বামনহাটির ডালে। তাও খেয়ে নয় গলায় মালা করে পরে। "মালা বাড়ে রোগ সারে"। "শহর গ্রামের হাজারো মানুষের বিশ্বাস—রোগের বিষ শুষে নিয়ে বড় হয় মালা, তাতেই রোগী রোগমুক্ত হয়"। কিন্তু অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় রীতিমত পরীক্ষার সাহায্যে দেখিয়েছেন ব্যাপারটা পুরোপুরি ভুয়ো। "ন্যাবার মালা সর্বদাই বাড়ে। বাড়ে মালা গাঁথার কৌশলে।" তিনি আরও জানিয়েছেন এটা এখন "কলকাতার দর্জিপাড়ার মিত্র-বাড়ীর পারিবারিক ব্যবসা। বাড়ীর ছোট্ট মেয়েটিও দ্রুত শিফার্স নটে মালা বুনতে পারে খেলাচ্ছলে"।

সাপ নিয়ে যে কিংবদন্তী ও ভুল ধারণা প্রচলিত আমাদের মধ্যে 'মানুষ' এ-নিয়ে বলতে গেলে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছে। সাপ সম্পর্কে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য এঁরা তুলে ধরেছেন এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় এবং এ ব্যাপারে সাহায্য নিয়েছেন সর্প বিশেষজ্ঞদের। যুগযুগ ধরে রহস্যঘেরা ধূমকেতু হেন প্রাকৃতিক ঘটনার সাথে মানুষ ও সমাজের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ জড়িয়ে ভয়ের উদ্রেককারী যেসমস্ত গল্পকথা প্রচলিত তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস দেখি শ্রীগৌরীশঙ্করের "ধূমকেতু সংস্কারে ও বিজ্ঞানে" শীর্ষক লেখায়।

কি কেন প্রশ্ন নয়—চিরাচরিত বিধিই একমাত্র সত্য এই বিশ্বাস সাবেক সমাজের পালটাকে সর্বদা বাতাসমুখী রাখার সহায়ক। তাই যারা এই সমাজের ধারক তাঁরা চান না প্রকৃত সত্য জানুক মানুষ। অতএব মানুষের চোখ খুলতে চায় যারা তারা এদের শত্রু। তাই যুগযুগ ধরে এঁদের রোষের বলি হয়েছেন বহু সত্যানুসন্ধানী মানুষ। 'মানুষের' 'প্রমিথিউসের পথে' শীর্ষক বিভাগে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে তেমন কিছু সংগ্রামী সত্যানুসন্ধানী মানুষের যেমন লুইগি গ্যালভানী, প্যারাসেলসাস্, চার্লস্ ডারউইন, জোসেফ প্রিস্‌লী ইত্যাদি। জাতিভেদ আমাদের সমাজের অন্যতম প্রধান কলঙ্ক ও ব্যাধি। বহুযুগ ধরে শাসকশ্রেণী এই বিভেদের ফয়দা লুটেছে আজও লুটছে। এই জাতিভেদ নিয়ে 'মানুষ' লিখেছে "শোষকশ্রেণীর কদর্য কৌশল জাতিভেদের নামে হরিজন নিপীড়ন।"

আজ দেশে দেশে মারণাস্ত্র নির্মাণের আয়োজন ও প্রতিযোগিতায় যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তেমন আর কিছুতেই নয়। আর এই গরম হাওয়ায় পড়ে দরিদ্র দেশগুলিও তাদের বুভুক্ষ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বিজ্ঞানের নামে গড়ে তুলছে সমরাস্ত্রের সম্ভার। এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন শ্রীসৌমিত্র শ্রীমানী এবং শ্রীঅভিজিৎ লাহিড়ী যথাক্রমে "নিরস্ত্রীকরণের এক দশক : প্রতিশ্রুতি ও পরিণতি" এবং "রোহিনী বিজয়ের অন্তরালে" শীর্ষক প্রবন্ধে। অভিজিৎ লাহিড়ী তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন "রোহিনী ভারতীয় বিজ্ঞানের জয় ততটা নয় যতটা তা ভারতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাফল্যসূচক"। প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন "নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি রো বা ঐ ধরনের জনস্বার্থ সংক্রান্ত কাজগুলির তুলনায় অনেক বেশী একাগ্র চেষ্টা ভারতের রয়েছে সামরিকীকরণ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলিতে"।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ 'মানুষ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত। এই সব নয়। আরও অনেক বিষয় এই পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে যা সংবেদনশীল মানুষের মধ্যে ভাবনার উদ্রেক করে। আর আজকের দিনে আরও বেশী বেশী মানুষকে ভাবাতে পারার সাফল্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের আরও বড় কাজের সাফল্যের চাবি-কাঠি। যে কাজের একমাত্র রসদ উদার সংস্কারমুক্ত সংগ্রামী মানুষ।

রুবান চক্রবর্ত্তী
ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও রুবান মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও
মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।